পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

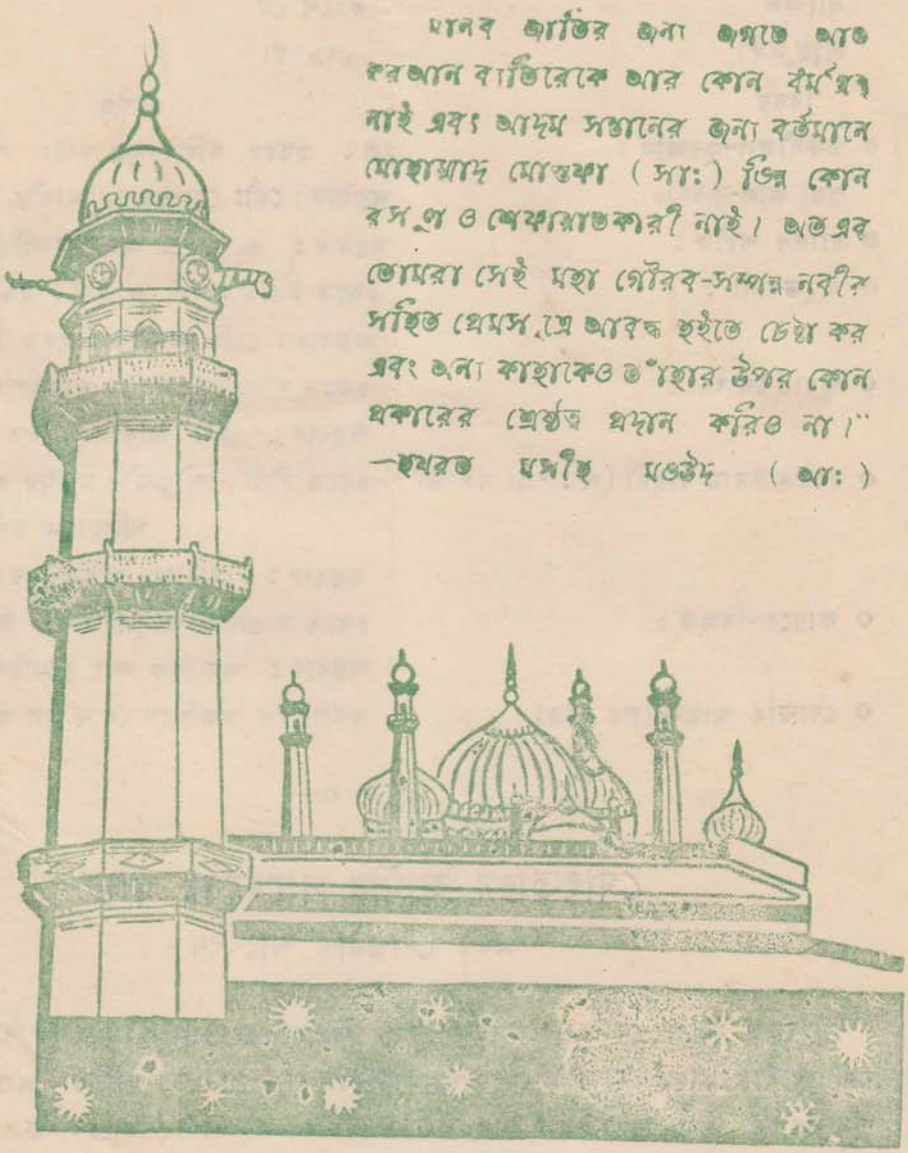

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৬ই জৈষ্ঠা, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে মে, ১৯৭৯ ইং : ৪ঠা রজব, ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩১শে মে ৩৩শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৯৭৯ ইং ২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বা: আ: আ:	১
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আ:) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৩
০ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর সত্যতা :	হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
০ কায়রো-বিতর্ক :	হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্দরী অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২২
০ খোদ্দাম আতফালের পাতা	বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া	২৬

—০—

মোহতারম আমীর সাহেবের স্বাস্থ্য
এবং দোওয়ার আবেদন

বিগত ২৫শে মে তারিখে ঢাকা পি, জি, হাসপাতালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের বাম সাইডের হার্নিয়া অপারেশন নিরাপদে সুসম্পন্ন হয় এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে মোহতারম আমীর সাহেব দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতেছেন। আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাকে আশু পূর্ণ শেফা দান করেন এবং কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দানে অধিকতর খেদমতে দ্বীনের তওফিক দেন—তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া জারি রাখিবেন। তিনি জামাতের সকলের জন্য দোওয়া করিতেছেন এবং সকলকে সালাম ও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

بسم الله الرحمن الرحيم — نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১৫ই বৈশাখ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে মে, ১৯৭৯ইং : ৩১শে হিজরত ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা আল-কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)— মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুরূপভাবে মুসলমানগণের পক্ষ হইতে لا نبی بعدی হাদিসটিও পেশ করা হইয়া থাকে। যদি ইহার এই অর্থ করা হয় যে "আমার মৃত্যুর পর কোন নবী নাই" তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে তাঁহার জীবদ্দশায় কি কোন নবী আসিতে পারিতেন? যখন তাঁহাকে সারা বিশ্বের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল তখন ইহা কিরূপে হইতে পারে যে তাঁহার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় কোন নবী আসিতে পারিবেন না এবং যখন তাঁহার জীবদ্দশাতেও কোন নবী আসিতে পারিতেন না তখন এই কথা বলার কি তাৎপর্য যে "আমার মৃত্যুর পর কোন নবী আসিবেন না"। প্রকৃতপক্ষে এই বাক্যের তাৎপর্য ইহাই ছিল যে 'আমার নবুওতের উপর এমন কোন যুগ আসিতে পারে না যদ্বারা উহা শেষ হইয়া যায়।'

এই কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য, এবং আমাদেরও আকিদা এই যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওতের কাল কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। তদনুযায়ী একদিকে যেমন আমরা হযরত মছীহ মওউদ (আঃ)-এর নবুওতের উপর ইমান রাখি অপরদিকে তেমনি ইহার সহিত আমরা এই বিশ্বাসও রাখি যে, তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কামেল গোলাম (অনুসারী) ছিলেন এবং তাঁহার শরীয়তের প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন। তাঁহার পৃথক কোন কলেমা বা নামায ছিল না। যেহেতু মানুষ কুরআন করীমের শিক্ষাকে ভুলিয়া গিয়াছিল সেই জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বীনকে পূণর্বার সঞ্জীবিত করেন। বস্তুতঃ ইহা যিল্লী (ছায়া) নবুওত। ছায়ার পৃথক অস্তিত্ব থাকেনা, বরং মূল বস্তুর প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে। সুতরাং لا نبی بعدی বাক্যেরও এই মর্ম যেরূপ "আমার মসজিদ আখেরুল মাসাজেদ" বাক্যের মর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছি।

কেবল ঐরূপ 'নবুওত' আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওতের প্রতি অমর্য্যাদাকর যাহার দাবী-কারক বলে যে "আমি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওতকে বাতিল করিলাম", এই প্রকারের নবুওতের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মর্য্যাদাহানি রহিয়াছে, যাহার দাবীকারক বলে যে 'আমি আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে কোন প্রকার কল্যাণ অর্জন করি নাই, এবং যে দাবী-কারক ইহা ঘোষণা করে যে, সে সরাসরি নবুওত লাভ করিয়াছে। সেই নবুওতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অমর্য্যাদা রহিয়াছে, যাহার দাবীকারক বলে যে আমি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রণীত সূত্রগুলিকে বাতিল করিয়া দিয়াছি, এইরূপ বাতিল করণ, আংশিক বা সার্বিক যে কোন ভাবেই হউক, একই কথা, এমনকি সে যদি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যে কোন একটি হুকুমকেও বদলাইয়া দেয়, তাহা হইলেও সে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তের বাতিলকারী-রূপে গণ্য হইবে। لا نبى بعدى হাদিস তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে এইরূপ বক্তাকে আমরাও কাফের ও দজ্জাল বলিব এবং নবী তো দূরের কথা আমরা তাহাকে একজন সাধারণ মুসলমান বলিতেও প্রস্তুত নহি।

প্রকৃতপক্ষে অন্য মুসলমানদের সহিত আমাদের এই মত লইয়াই বিভেদ যে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে শেষ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ হইতে নাযেল হইবেন। আমাদের বক্তব্য এই যে তিনি মুসায়ী সিলসিলার নবী ছিলেন এবং তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) হইতে কল্যাণ লাভ না করিয়াই নবুওত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব, এরূপ নবীর প্রত্যাগমনের ধারণা রাখা যিনি তাঁহার গোলাম নহেন, তাঁহার প্রতি গুরুতর অপমান-সূচক।

ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মত বিপথগামী হইল তখন তাঁহার উম্মতের সংশোধনের জন্য তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতে কেহ আবির্ভূত হইল না এবং ইহার জন্য দুইহাজার বৎসরের পুরাতন এক নবীকে আসিতে হইল—এইরূপ আকিদা রাখা সুনিশ্চিতভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্য সাংঘাতিক ভাবে অবমাননাকর। ইহাতে মোহাম্মদী উম্মতকে মুসায়ী উম্মতের নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইতে হয়। ইহা কোন সত্যিকার মুসলমান বরদাশত করিবে না। ইহা আশ্চর্যজনক কথা যে একদিকে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে মানবকুল শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে এবং নবীকুল শিরোমণি বলা হইয়া থাকে এবং অন্যদিকে বলা হয় যে যখন তাঁহার উম্মত পথগামী হইয়া যাইবে তখন তাহাদের-সংশোধনের জন্য বাহির হইতে একজন নবী আসিবেন যিনি মুসায়ী সিলসিলার নবী হইবেন। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি হইবে না যিনি তাহাদের বিপথগামিতা দূর করিতে পারেন, ইহা ঐরূপ কথা যেমন কোন দুষমণ চড়াও করিয়া আসিলে ইহা বলা হয় যে আমাদের বাদশাহ পরম শক্তিশালী কিন্তু যেহেতু তাহার নিকট দুষমণের মোকাবিলা করার কোন ফৌজ নাই, সুতরাং অন্য বাদশার নিকট হইতে ফৌজ ভিক্ষা করা হউক। দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে তাহাদের আক্কেল কি ভাবে মরিয়া গিয়াছে

এবং তাহারা কিভাবে এই আকিদা রাখে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের উপর যখন শয়তানের হামলা হইবে তখন তাহার মোকাবেলা করিবার জন্য তাহার নিকট কোন ফৌজ থাকিবে না তাঁহার সাহায্যার্থে মুসায়ী সিলসিলার নবী ঈসা (আঃ) আসিবেন এবং তিনি দুষমনের মোকাবেলা করিবেন এবং এইভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)কে তিনি নিজে এই দানের তলে আনিবেন। আমার নিকট এইরূপ আকিদা পোষণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি মারাত্মক অবমাননাকর।

যাহার অন্তরে অল্প পরিমাণ ইমান এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্য ভালবাসা আছে সে কখনও এইরূপ যালেমানা আকিদা মানিয়া লইতে পারে না। এইখানে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'আখেরুল আম্বিয়ার" এই অর্থ যদি করা যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) সকল নবীর শেষে আসিয়া ছিলেন তাহা হইলে ইহার কেবল এই অর্থ হইবে যে তিনি নবীগণের লাইনের শেষে খাড়া ছিলেন যাহা নীচে নক্সায় দেখান হইল :

'আল্লাহ'

'অপরাপর সকল নবী

'হযরত মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ (সাঃ)'

'মানব সমুহ'

ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি লাইনের শেষে থাকে সে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয় না। শেষ হওয়ার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। ইহাতো ঐরূপ কথা যেমন এক লাইনে বহু সিপাই খাড়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতে শুরু করা যায় যে এই সিপাই সকলের শ্রেষ্ঠ কারণ সে সকলের শেষে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই বরং অন্যদের ন্যায় সেও একজন সিপাহী। অনুরূপভাবে গায়ের আহমদী উলেমার কথা অনুযায়ী যদি আঁ-হযরত (সাঃ)-কে লাইনের শেষে আখেরী নবী মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না বরং তিনি অপরাপর নবীগণের ন্যায় একজন নবী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। কিন্তু আশ্চার্যের কথা যে আঁ-হযরত (সাঃ)কে এই হাদিসে 'আখেরুল আম্বিয়া' বলা হইয়াছে কিন্তু আর এক হাদিস আছে যাহাতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে 'আউয়ালুল আম্বিয়া" (নবীগণের প্রথম) বলা হইয়াছে। সেই হাদিস হইল كنت خاتم النبيين وادم منجدل فى طينة অর্থাৎ 'আমি সেই সময়েও খাতামান্নাবীয়ীন ছিলাম যখন আদম মাটির মধ্যে অবস্থান করিতে ছিল' অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ) আদম (আঃ)-এর জন্মের পুর্বেও খাতামান্নাবীয়ন ছিলেন।

অন্য কথায় তিনি 'আউয়ালুন্নবীয়ীন' ছিলেন—নবীগণের প্রথম ছিলেন। এখন যদি গায়ের আহমদী উলেমার কথা অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)কে নবীগণের লাইনে সকল নবীর শেষ নবী বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে তিনি নবীগণের প্রথম হওয়া সাব্যস্ত হয় না কিন্তু এই দুইটি হাদিসকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর একটি কাশফের সহিত মিলাইয়া

দেখিলে উভয় হাদিসের মর্ম পরিস্কার হইয়া যায় অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ এর নবীগণের আখের হওয়াও সাব্যস্ত হইয়া যায় এবং নবীগমের শেষ হওয়াও সাব্যস্ত হইয়া যায় এবং ইহাও সাবস্ত হইয়া যায় যে তিনি সকল নবীর শ্রেষ্ঠ। মসনদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে একটি রেওয়ায়েত আসিয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমায় মেরাজ লাভ হইল তখন আমি প্রথম আসমানে গেলাম, যেখানে হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আমি তাঁহাকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া গেলাম অতঃপর আমি ২য় আকাশে পৌঁছিলম। সেখানে হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন ; আমি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া গেলাম। অতঃপর আমি তৃতীয় আকাশে পৌঁছিলাম সেখানে হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন, আমি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম। অতঃপর আমি চতুর্থ আসমানে পৌঁছিলাম, সেখানে হযরত ইদ্রিস (আঃ) ছিলেন ; আমি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া চলিয়া গেলাম এবং পঞ্চম আকাশে পৌঁছিলাম, সেখানে হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন। আমি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উপরে চলিয়া গেলাম এবং ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছিলাম। সেখানে হযরত মুসা (আঃ) ছিলেন, আমি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া সপ্তম আকাশে গিয়া পৌঁছিলাম, সেখানে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ছিলেন। তখন জিব্রাইল (আঃ) আমাকে বলিলেন, আপনি আরও উপরে চলুন। আমি আরও উপরে গেলাম এবং সিদরাতুল মুনতাহাতে গিয়া খাড়া হইলাম এবং সেখানে আল্লাহতা'লার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আল্লার দিকে এই সফর নিম্নাঙ্কিত নকশার দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে :—

'আল্লাহ'

সিদরাতুল মুনতাহা—মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)

সপ্তম আস্‌মান—হযরত ইব্রাহীম (আঃ)	
ষষ্ঠ আসমান—হযরত মূসা (আঃ)	
পঞ্চম আসমান—হযরত হারুন (আঃ)	
চতুর্থ আসমান—হযরত ইদ্রিস (আঃ)	
তৃতীয় আসমান—হযরত ইউছুফ (আঃ)	
দ্বিতীয় আসমান- হযরত ঈসা (আঃ)	হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)
প্রথম আসমান—হযরত আদম (আঃ)	
পৃথিবীর বাসিন্দা	

এখন উপরের চিত্রের দিকে তাকাইলে সৃষ্টজীবের মোকামে দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তি দেখিবে তাহার দৃষ্টি সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ)-এর উপর পড়িবে এবং সর্ব শেষ তাহার দৃষ্টি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর পড়িবে। এই চিত্র দেখিয়া সে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে সর্বশেষ নবী বলিবে। এতদ্বারা তাঁহার হাদিস 'আখেরুল আম্বিয়া' অর্থাৎ 'আমি নবীগণের আখের' হাদিসটিও সত্য হইয়া যায় এবং তিনি সকল নবীর শ্রেষ্ঠও সাব্যস্ত হইয়া যান। তিনি হযরত আদম (আঃ) হইতে এইজন্য শ্রেষ্ঠ হইয়া যান যে তিনি তাঁহাকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি হযরত ইউছুফ (আঃ) হইতে শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে তিনি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া যান তিনি হযরত ইদ্রিস আঃ) হইতেও শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে তিনি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া যান। তিনি হযরত হারুন (আঃ) হইতেও শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে তিনি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া যান। তিনি হযরত মুসা (আঃ) হইতেও শ্রেষ্ঠ এইজন্য যে তিনি তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধে চলিয়া যান। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতেও শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে তিনি তাঁহাকেও ছাড়িয়া উর্দ্ধে চলিয়া যান। কিন্তু যদি উপরোক্ত চিত্রে আল্লাহতায়ালার মোকামে খাড়া হইয়া দৃষ্টিপাত করা যায় তাহা হইলে সর্বপ্রথম হযরত রছুল করিম মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাম নযরে পড়িবে। অতঃপর যথাক্রমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ), হযরত হারুন (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত ইউছুফ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এবং হযরত আদম (আঃ) নযরে পড়িবেন। সুতরাং তিনি 'আখেরুল আম্বিয়া' এবং 'আউয়ালুল আম্বিয়া' উভয়ই, কিন্তু ইহা সেই মজমুনেই, যাহার উল্লেখ আমি করিয়াছি, নচেৎ জন্মের দিক দিয়া كنت خاتم النبيين وادم منجدل فى طينته অর্থাৎ, "আমি খাতামান্নাবীয়ীন, যখন আদম মাটির মধ্যে অবস্থান করিতে ছিলেন" কিরূপে সত্য হইবে ?

এই ব্যাখ্যার দিক দিয়া او تيت فوا تح الكلم و جوا معه و خوا تمه—আঁ-হযরত (সাঃ -এর এই হাদিসটির অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। কারণ সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী মোকামে যাহার সহিত বাক্যালাপ হইয়াছে সুনিশ্চিতভাবে তাঁহার নিকট হইতে উত্তম কালাম লাভ হইয়াছে এবং বান্দাদের মধ্য হইতে যিনি সবার উর্দ্ধে গিয়া কালাম লাভ করিয়াছিলেন তিনিই পরম ও চরম কালাম লাভ করিয়াছিলেন, কারণ বাকী সর্বপ্রকার কালাম উহার নিম্নস্তরের (নীচের মোকামের) হইয়াছে এবং যেহেতু আ-হযরত (সাঃ) সকল মোকাম পার হইয়া উপরে পৌঁছিয়া ছিলেন সেইজন্য তিনি পূর্ণ কালাম পাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে أنا اخر الانبياء এবং لا نبى بعدى হাদিসদ্বয় মে'রাজের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট মে'রাজের হাদিস উহাদের অর্থকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে কিন্তু মুসলমানগণ ভুলক্রমে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে সর্ব প্রকারের নবুওতের দরজা বন্ধ। মনে হইতেছে, স্বয়ং সাহাবা (রাঃ) আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে খতমে নবুওতের বিষয়ে মানুষ বাড়াবাড়ি করিবে এবং এই বিষয়ের উপর আঁ-হযরত (সাঃ) এর বেশী জোর

দেওয়ার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তদনুযায়ী নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি বিষয়টির উপর বিশেষ আলোকপাত করিবে :—

১) তুররে মনসুরে ইবনে আবি শায়বা হইতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) সাহাবা (রাঃ)-কে ইহা বলিতে শুনিলেন যে انه خاتم النبيين و لا نبى بعده

অর্থাৎ 'তিনি খাতামান্নাবীয়ীন এবং তাহার পর কোন নবী আসিবেননা।' তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত জোর দিয়া বলিলেন :

قولوا خاتم النبيين و لا تقولوا لا نبى بعده

অর্থাৎ "তাঁহাকে 'খাতামান্নাবীয়ীন' বল কিন্তু তাঁহার পর নবী আসিবেন না বলিও না।" ইহা অত্যন্ত সহজ কথা যে আঁ-হযরত (সাঃ) যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) রদ করিতে পারেন না। ইহা কিরূপে হইতে পারে যে আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়া গেলেন যে لا نبى بعدى অর্থাৎ 'আমার পরে নবী নাই' কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) উহা রদ করেন এবং বলেন যে —ولا تقولوا لا نبى بعده অর্থাৎ 'তাঁহার পরে নবী আসিবেন না বলিও না'! হযরত আয়েশা' (রাঃ)-এর ন্যায় বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মাহলার পক্ষ হইতে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল যে, "خاتم النبيين কোরআন করীমের বাক্য। ইহা বুঝতে কোন ভুল হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু لا نبى بعدى দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব, সুতরাং 'খাতামান্নাবীয়ীন বল কিন্তু তাঁহার পর কোন নবী আসিবে না বলিও না; নচেৎ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তো বুঝিয়া লইবে যে خاتم النبيين এবং لا نبى بعدى এর অর্থ ইহাই যে আমার পর এমন কোন নবী আসিবে না যে আমার সিলসিলাকে শেষ করিবে এবং আমার শরীয়তকে বাতিল করিয়া দেয়, কিন্তু একজন মূর্খ ব্যক্তি অর্থ করিবে যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে এরূপ নবীও আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার শিষ্য হন এবং তাঁহার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কারণেই আঁ-হযরত (সাঃ) স্বয়ং لا نبى بعدى বলা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, قولوا خاتم النبيين و لا تقولوا لا نبى بعده

—"তাঁহাকে খাতামান্নাবীয়ীন বল, এই কথা বলিও না যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে কোন নবী আসিবেন না।" লোকগণকে لا نبى بعدى বলা হইত হযরত আয়েশা (রাঃ) এর রুখিবার কারণ ইহাই ছিল যে তাহারা যেন কোন ভ্রান্ত আকিদায় কায়েম হইয়া না যায় যেমন হাদিসে আছে যে একসময় আঁ-হযরত (সাঃ) মসজিদে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। সাহাবী (রাঃ) ঘাবড়াইয়া গেলেন যে তিনি কোথায় গেলেন। সেই সময় শাম দেশ হইতে খৃষ্টানদের দ্বারা যে কোন মুহূর্তে মদিনা আক্রমণের আশঙ্কা সৃষ্টি হইল। সেইজন্য সাহাবা (রাঃ)-এর মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হইল যে না-জানি দুষমন আক্রমন করিয়া ফেলিয়াছে তদনুযায়ী সাহাবা (রাঃ) তাঁহার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন। হযরত আবু হোরায়রা বলিয়াছেন যে, "আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে এক বাগানের দিকে চলিয়া গেলাম। উহার বড় দরজা বন্ধ দেখিলাম, ইহা দেখিয়া আমি ভিতরে যাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলাম এবং একটি সরু গর্ত দিয়া বিড়ালের মত

ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং সেখানে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে দেখিলাম । আমি বলিলাম, আমরা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম যে, হুযুর কোথায় চলিয়া গেলেন এখন আপনাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, আবু হোরায়রা ! তুমি যাও এবং যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে তাহাকে বলিও : مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ "যে কেহ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে সে জান্নাতে যাইবে" । হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, "হে আল্লার রসুল ! এত বড় কথা কে মানিবে ? আপনি আমাকে কোন নিদর্শন দেন।' আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাকে নিজের জুতা দিয়া দিলেন। যখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহার সহিত হযরত ওমর (রাঃ)-এর দেখা হইল। হযরত আবু হোরায়রা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার সহিত যাহার দেখা হইবে আমি তাহাকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিই যে, مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে সে জান্নাতে যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা শুনা মাত্রই তাঁহার বুকের উপর জোরের সহিত ঘুষ মারিলেন এবং বলিলেন, তুমি লোকদের ঈমান খারাপ করিতে চাহ। হযরত আবু হোরায়রা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রসুল ! হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে মারিয়াছেন, আপনি আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে তোমার সহিত যাহার সাক্ষাৎ হয় তাহাকে বলিও : مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে কেহ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে সে জান্নাতে যাইবে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন হে আল্লার রসুল তত বড় কথা কে মানিবে আপনি আমাকে কোন নিদর্শন দেন। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহাকে নিজের জুতা দিয়াদিলেন যখন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহার সহিত হযরত ওমর (রাঃ)-এর দেখা হইল। হযরত আবু হোরায়রা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে আমার সহিত যাহারই দেখা হইবে আমি তাহাকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিই যে,

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লাএলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে যাইবে। কিন্তু যখন আমি হযরত ওমরকে (রাঃ) বলিলাম, তখন তিনি আমাকে ঘুষি মারিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ ও আসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লার রসুল ! আপনি কি ইহা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে সে জান্নাতে যাইবে ? আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, হাঁ। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লার রসুল ! ইহাতে কমজোর লোকেরা আমল ছাড়িয়া দিবে। তখন আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, বহুত আচ্ছা, ঘোষণা বন্ধ করিয়া দাও ! এতদ্বারা দেখা গেল যে তিনি নিজেই একটি আদেশ দিলেন এবং, নিজেই আবার ইহার এলান বন্ধ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এই সংবাদ হযরত ওমর (রাঃ) এর জন্য ছিল এবং যখন ইহা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া গেল তখন আঁ-হযরত (সাঃ) ইহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু ইহা ঠিক নহে. প্রকৃতপক্ষে ইহার লক্ষ্য সকল মোমেন ছিলেন এবং হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে যে ব্যক্তি সাচ্চা দিলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে এবং উহার উপর আমল করে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে যাইবে। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫৬। স্বাস্থ্য, রোগ ও চিকিৎসা

৩৩৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু-তা'লা আনহুমা বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "দুইটি 'নেয়ামৎ' এমন যে ইহাদের কদর (সম্মান ও যত্ন) না করিয়া অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক, স্বাস্থ্য দুই স্বচ্ছলতা।"

['বুখারী, 'কিতাবুর-রিকাক ; ২ : ৯৪৯ ; 'তিরমিযি,' ২ : ৫৪ পৃ:]

৩৪০। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে হযরত জেব্রীল (আ:) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন ; "মুহাম্মদ (সা:), আপনি অসুস্থ ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি অসুস্থ।" ইহাতে হযরত জেব্রীল এই দোয়া করিলেন :

"আল্লাহতায়ালার নাম লইয়া আমি আপনার উপর ফুঁ দিতেছি (দম করিতেছি)। তিনি আপনাকে এমন সব বিষয় হইতে নিরাপদ রাখুন যাহা ক্ষতিকর। তিনি এমন সব জিনিষ হইতে আপনাকে রক্ষা করুন, যাহা দুঃখ দিতে পারে। তিনি প্রত্যেক কুজনের অপকারিতা হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। প্রত্যেক ঈর্ষা পরায়ণ হিংসুকের কুদৃষ্টি হইতে আপনাকে হিফাজত করুন। আল্লাহতায়ালা আপনাকে আরোগ্য দিন। আল্লাহতায়ালার নাম লইয়া আমি আপনার উপর ফুঁ দিতেছি (দম করিতেছি)।" ['মুসলিম,' কিতাবুস-সালাম', ১-২ : ১৩ পৃ:]

৩৪১। হযরত আনাস রাযিয়ল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের কেহ কোন রোগের কারণে মৃত্যু কামনা করিবে না। যদি সে একান্তই সহিতে না পারে এবং এই সম্পর্কে কোনো দোওয়া করিতে চায় তবে এইরূপ দোওয়া করিবে ;

'আল্লাহ আমার, তুমি আমাকে জীবিত রাখ, যে পর্যন্ত জীবনধারণ আমার জন্য উত্তম এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যদি মৃত্যু আমার জন্য ভাল'।

['মুসলিম', কিতাবু-যিকির, 'বাবু কেরাহিয়াতুল মাওতে ২-২ : ২২৫ পৃ:]

৩৪২। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুমা বলেন যে একবার হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিরিয়া যাত্রা করেন। যখন তিনি 'সরগ' নামক স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তখন সৈন্য প্রধানগণ, হযরত আবু উবায়দাহ এবং তাঁহার অন্য সাথীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থে উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে, সিরিয়া দেশে মহামারি দেখা দিয়াছে। ইবনে আববাস (রা:) বলেন, "হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলিলেন : 'বুজুর্গ, প্রবীণ মুহাজের সাহাবাগণকে ডাকিয়া আন'। আমি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। হযরত উমর (রা:) তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। বলিলেন যে, সিরিয়ায় মহামারি উপস্থিত। এখন কি করা উচিৎ ? তিনি সেখানে যাইবেন ? না, এখান

হইতেই ফিরিয়া যাইবেন।' সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে মতানৈক্য হইল। কেহ কেহ বলিলেন : 'আপনি এক উদ্দেশ্য নিয়া মদিনা হইতে আসিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য পুরা না করিয়া আপনার চলিয়া যাওয়া ঠিক নয়।' কেহ কেহ বলিলেন : 'আপনার সাথে বাছা বাছা ব্যক্তিগণ আছেন। আ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ প্রিয় এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।' মহামারির এলাকায় তাঁহাদিগকে লইয়া আপনার যাওয়া সমীচীন নয়। কোনো বিপদ ঘটিতে পারে।' মুহাজেরগণের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণের পর হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : 'আনসারগণকে ডকিয়া আন'। আমি আনসারগণকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহারাও মুহাজেরগণের ন্যায় মত-ভেদ প্রকাশ করিলেন। আনসারগণের সঙ্গে পরামর্শের পর হযরত উমর (রাঃ) আমাকে ফরমাইলেন : 'কুরাইশ সর্দারগণের মধ্যে যাহারা এখানে আছেন, তাঁহাদিগকে আন।' যখন তাঁহারা আসিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখে—অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন তাঁহারা একবাক্যে অভিমত পেশ করিলেন : 'ইহাই সমীচীন যে, আপনি আপনার সাথীগণকে লইয়া ফিরিয়া যান এবং মহামারির এলাকায় প্রবেশ না করেন। হযরত উমর (রাঃ) ঘোষণা করিলেন যে, পর দিন সকালে তিনি প্রস্থান করিবেন। সব সাহাবা ভোরের সময় উপস্থিত হইলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁহাদিগকে ফরমাইলেন : 'আপনারাও আমার সঙ্গে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হন'। হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ) তখন বলিলেন : "আপনি কি আল্লাহতায়ালার 'তকদীর' (নিয়তি) হইতে পলায়ন করিতেছেন?" হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : "আবু উবায়দাহ (রাঃ), অন্য কেহ একথা বলিত! আপনার মুখে ইহা শুনিব, আশা করি নাই।" প্রকৃতপক্ষে হযরত উমর (রাঃ) যেন আবু উবায়দাহ (রাঃ)-র মতভেদ পছন্দ করিতেন না এবং তাঁহার অভিমতকে বড়ই গুরুত্ব দিতেন। যাহা হউক, হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : আমরা আল্লাহতায়ালার তকদীর হইতে পালাইয়া আল্লাহতায়ালার তকদীরের দিকেই যাইতেছি। ধরুন, আপনাদের উট এমন কোন উপত্যকায় পৌঁছিল, যাহার দুই ঘাটি। একটি 'সবুজ' ঘাসপাতায়, গাছগাছড়ায় পূর্ণ। অন্যটি শুষ্ক। উহাতে পানি বা ঘাস ও লতাপাতা কিছুই নাই। আপনারা আল্লাহতায়ালার 'তকদীর' (নিয়তি) অনুযায়ী আপনাদের উট সবুজ উপত্যকাংশে চরাইবেন, না ঘাস-পানি শূন্য অংশে?" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইতিমধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কোনো কাজে গিয়াছিলেন। পরামর্শের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এই সব কথা-বার্তা শুনিয়া বলিলেন : "এ সম্বন্ধে আমার সঠিক পন্থার জ্ঞান আছে। আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনিয়াছি। তিনি ফরমাইতেন : 'যখন তোমরা জানিতে পার যে, কোন এলাকায় মহামারি আছে, তখন সেখানে যাইবে না এবং যদি ঐ এলাকায় মহামারি উপস্থিত হয়, যেখানে তোমরা থাক, তবে সেখান হইতে পালাইয়া অন্য কোন স্থানে যাইবে না।" হযরত উমর (রাঃ) এই কথা শুনিয়াএই বলিয়া খোদাতায়ালার শোকর আদায় করিলেন যে, তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক দিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই পরামর্শ ও মীমাংসার পর তিনি মদিনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

['মুসলিম,' 'কিতাবুস-সালাম, ২-২ : ২৭ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

নবীগণের মিশনের পূর্ণতা খেলাফতের সহিত সম্পর্কিত :

"ইহা খোদাতায়ালার সুন্নত বা চিরাচরিত বিধান এবং এই চিরাচারিত বিধান তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির সময় হইতে সর্বদা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন যে তিনি রসুল গণের সাহায্য করেন এবং তাঁহাদের বিজয় দান করেন। কারণ খোদা বলিয়াছেন: 'কাতাবাল্লাহু লাআগ্‌লাবান্না আনা ওয়া রুসুলী' অর্থাৎ খোদাতায়ালা এই বিধান করিয়াছেন যে তিনি এবং তাঁহার নবী 'গালেব' থাকিবেন। 'গালবা' শব্দের অর্থ এই যে রসুল ও নবীগণ যেমন ইচ্ছা করেন যে খোদার 'হুজ্জত' বা অকাট্য যুক্তি পৃথিবীতে যেন পূর্ণভাবে কায়েম হয় এবং কেহই যেন ইহার মোকাবেলা করিতে সক্ষম না হয় সেই জন্য খোদা তায়ালা প্রবল নিদর্শন সমূহ দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, খোদাতায়ালা তাহার বীজ তাঁহাদের হস্তেই বপন করেন। কিন্তু তিনি ইহার পূর্ণতা তাঁহাদের হাত দ্বারাই করান না, বরং এমন সময়ে তাঁহাদের ওফাত দেন যে, বাহ্যতঃ বিফলতার ভীতি পরিদৃষ্ট হয় এবং তিনি বিরুদ্ধ-বাদীদের হাসি-ঠাট্টা ও নিন্দা-বিদ্রূপের সুযোগ দেন। যখন তাহারা হাসি ঠাট্টা করিতে থাকে তখন পুনরায় নিজ কুদরতের দ্বিতীয় হস্ত প্রদর্শন করেন এবং এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যেগুলির দ্বারা অসম্পূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ খোদাতায়ালা দুই প্রকারের কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রদর্শন করেন: (১) প্রথমত নবীগণের মাধ্যমে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন এবং (২) তারপর এমন সময় অপর হস্ত প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং দুশমন শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে এই নবীর কার্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা বিশ্বাস করে যে, এখন এই জামাত ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে, এমনকি জামাতের লোকগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। তাহাদের কটি-দেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া যায়। তখন খোদাতায়ালা পুনরায় তাঁহার মহা শক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে তাহারা খোদাতায়ালার এই মোজেযা প্রত্যক্ষ করে। যেমন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাধারণও শোকাভিভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। তখন খোদাতায়ালা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান

করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যাহা তিনি বলিয়াছিলেন "লা-ইউ-মাক্কেনান্না লাহুম দীনাহুমুল্লাযী-রতাযা-লাহুম ওয়ালা ইউবাদ্দেলান্নাহুম মিম বাদে খওফে হিম আম্না" অর্থাৎ ভয়ের পর আমি তোমাদিগকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব" (সুরা আল-নূর)।"

(আল-অসিয়ত, ১৯০৫ই, বাংলা অনুবাদ, পৃঃ ৫—৭)

খেলাফত প্রতিষ্ঠার সুসংবাদ

কুদরতে সানায়া অর্থাৎ খেলাফতের শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত ছিন্ন হইবে না :

"সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহতায়ালার বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান সুতরাং এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতায়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। তাই আমি তোমাদিগকে (আমার মৃত্যুকাল সম্পর্কে) যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং উহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না।

সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না। আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সংগে থাকিবে। ইহাই খোদাতায়ালা 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের জন্য নহে। সেই প্রতিশ্রুতি তোমাদের জন্য। খোদা-তায়ালা বলিতেছেন : "আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দান করিব।" সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, যেন ইহার পর সেই দিবস আসিতে পারে যাহার জন্য চিরপ্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের খোদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি তোমাদিগকে সব কিছুই দেখাইবেন যাহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদিও বর্তমান যুগ আখেরী যুগ এবং বহু বিপদাপদ আছে যাহার আবির্ভাব সময় এখন সমুপস্থিত, তথাপি এই পৃথিবী সেই সময় পর্যন্ত কখনো বিলুপ্ত হইবে না যে পর্যন্ত সেই সমুদয় বিষয়ই পূর্ণ না হয় যেগুলি সম্বন্ধে খোদা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়াছেন।" (আল-অসিয়ত, বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা, ৭ ৮)

খেলাফত আল্লাহর রহমত অবতরণের অন্যতম সূত্র এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর সন্তানগণের মধ্য হইতে খলিফা হওয়ার সুস্পষ্ট সংবাদ :

"আল্লার রহমত অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল নবী-রসুল, ইমাম ও খলিফাগণে প্রেরণ যাহাতে মানুষ তাঁহাদের অনুসরণ এবং হেদায়েত দ্বারা সৎ-পথে পরিচালিত হয়।

এবং তাঁহাদের আদর্শের ভিত্তিতে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিয়া পরিত্রাণ বা নাযাত লাভ করিতে পারে। সুতরাং খোদাতায়ালা চাহিয়াছেন যে এই অধমের সন্তানদের মাধ্যমে যেন আল্লাহর রহমত নাযেল হওয়ার উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি প্রকাশিত হয়।" সবুজ ইস্তেহার)

নেজামে খেলাফতের চিরস্থায়ী প্রয়োজনীয়তা ও উহার গুরুত্ব :

"স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলিফা বলে এবং রসুলের স্থলাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিই হইতে পারেন যাহার মধ্যে যিল্লিভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসুলের কামালিয়ম সমূহ বিদ্যমান থাকে। এই জন্য রসুল করীম (সাঃ) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলিফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেন নাই। কেননা খলিফা প্রকৃতপক্ষে রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ খলিফা রসুলের যিল্ বা প্রতিবিম্ব। যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় না, সেইজন্য খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে নবীগণের সত্ত্বাকে—যাহা পৃথিবীর সকল সত্ত্বা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম—কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব স্বরূপ কায়েম রাখিবেন। এই উদ্দেশ্যে খোদাতায়ালা খেলাফতের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেন দুনিয়া কখনো এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হইতে বঞ্চিত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু মাত্র ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে সে নিজ অজ্ঞতা বশতঃ খেলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদাতায়ালার এই ইচ্ছা কখনই ছিল না যে রসুল করীম (সাঃ)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলিফাগণের ভুবণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তাহার পর দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যায় তো যাক কোন পরোয়া নাই।" (শাহাদত তুল কুরআন, পৃঃ ৫৮)

সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

২৭শে মে খেলাফত দিবস

কুরআন শরীফে ও সহি হাদীসে প্রতিশ্রুত "খেলফত-আলা-মিনহাজেন-নুবুত" পুনঃ প্রতিষ্ঠার মহান দিবস ২৭শে মে ইসলাম ও আহমদীয়াত তথা মানব ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র দিবস। ২৬শে মে ১৯০৮ সনে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এন্তেকালের পরবর্ত্তী দিবসে কুরআন ও হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রণীত আল-ওসীয়ত পুস্তকে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার প্রথম বিকাশস্থল ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত মৌঃ নূরুদ্দীন রাঃ) ও দ্বিতীয় মহান খলিফা ছিলেন হযরত মুসলেহ মওউদ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) বর্ত্তমানে তৃতীয় খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন হযরত ফাতেহ উদ্দীন হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) এই পবিত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে খেলাফতের মর্যাদা, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও কল্যাণ এবং উহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জামাতে যথারীতি বিশেষ আয়োজন করা হয়। যে জামাতে এই দিবস এখন ও পালন করা হয় নাই, অতি সত্বর তাহা পালন করা বাঞ্ছনীয়।

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৮ ইং সনে মজলিস আনসারুল্লাহর কেন্দ্রীয় সালানা ইজতেমায় নেযামে খেলাফত বিষয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করিয়াছিলেন উহার সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ পেশ করা হইল।]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

আয়াতে-ইস্তেখলাফে আল্লাহতায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সহিত বিভিন্ন আকার-পদ্ধতির খেলাফত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করিয়াছেন।

মুজাদ্দেদিয়াতে-উয্‌মা এবং খেলাফতে ইয্‌মা এখন কেয়ামতকাল পর্যন্ত একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ আঃ)-ই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় বিষয় যাহা আমি একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে চাই তাহা হইল নেযামে খেলাফত। ইহা আল্লাহতায়ালা পূর্ববর্তী নবীগণের জামাত সমূহে তাহাদের অবস্থানুযায়ী প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং যাহা ইসলামেও আল্লাহতায়ালা কায়েম করিয়াছেন। ইহাকে তিনি একটি ওয়াদা ও বিশেষ সুসংবাদ হিসাবে কায়েম করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, যেরূপে ও যে রঙে হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতে খালফাগণের নেযাম (সংগঠন) কায়েম করা হইয়াছিল, সেই রূপে ও সেই রঙে উম্মতে মুস্লিমাতেও খালফাগণের নেযাম কায়েম করা হইবে। তাঁহারা খলিফা ও মুজাদ্দিদ হইবেন। আয়াতে ইস্তেখলাফে (সুরা নূহের আয়াত নং ৫৬) এই ওয়াদা প্রদত্ত হইয়াছে। এবং নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর একটি হাদিস আছে যাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহতায়ালা মুজাদ্দিদ প্রেরণ করিবেন যাঁহারা তাঁহার দ্বীনের তাজদীদ বা সংস্কার করিবেন। এখানে এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) কুরআন করীমে বর্ণিত বিষয়াবলীর অতিরিক্ত কোন কথা বলেন নাই। তিনি যাহা কিছুই বলিয়াছেন তাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত নীতির ও 'এজমাল' (সংক্ষিপ্ত উক্তি)-এর তফসীর ও বিস্তৃত বিবরণ মাত্র।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন : 'যে সকল ব্যক্তি বেলায়াতে উয্‌মার ওহীর আলোকে আলোকিত হইয়া থাকেন তাঁহারা لا يمسه الا المطهرون (কুরআনের অন্তর্নিহত তত্ত্ব কেহ স্পর্শ করিতে পারে না কিন্তু পবিত্রকৃত ব্যক্তিবৃন্দ -এর দলের অন্তর্গত। তাঁহাদের সহিত আল্লাহতায়ালার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, বিভিন্ন সময়ে কুরআন করীমের

গোপন সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের নিকট ইহা প্রমাণ করিয়া দেন যে, (কুরআনের) অতিরিক্ত কোন শিক্ষা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে তিনি দান করেন নাই, বরং সহি হাদিস সমূহ কুরআন করীমের ইজমাল ও ইশারা সমূহের বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত বিবরণ মাত্র রহিয়াছে। সুতরাং এই মা'রেফত (জ্ঞানতত্ত্ব) লাভে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা তাঁহাদের উপর প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত, সেই সকল আয়াতে-বাইয়েনাতের সত্যতাও তাঁহাদের নিকট দেদীপ্যমান হয় যাহাতে আছে যে, কুরআন করীমের বাহিরে কোন কথা নাই।" (আল-হক—মুবাহেসা-লুধিয়ানা পৃঃ ৭৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এখানে একথা বলিয়াছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে সর্বদা মুতাহহার (পবিত্র কৃত ব্যক্তি বৃন্দের) একটি দল সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে, হইতে থাকে এবং হইতে থাকিবে, এবং এই মুতাহহার দলটিকে, কুরআন শরীফের لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা অনুযায়ী সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন করীমের গোপন জ্ঞান-ভাণ্ডার ও রহস্য সমূহের মধ্য হইতে বহু কিছু দান করিতে থাকিবেন। তদনুযায়ী তাঁহারা সন্দেহাতীতরূপে একথার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবেন যে, যেভাবে পবিত্র কুরআনের নূতন নূতন তথ্য আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন, তেমনভাবে নবী করীম (সাঃ)-কে, যিনি মুতাহহারগণের সরদার ও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের চাইতেও অনেক বেশী কুরআনী সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী শিক্ষা দিতেন, এবং তিনি যাহা কিছুই বলিয়াছেন তাহা কুরআন করীমেরই তফসীর ছিল, তাহার অধিক কোন কথা তিনি বলেন নাই। এখন হাওয়ালা তো আমার কাছে নাই, কিন্তু আমার স্মরণ পড়ে যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) অন্যান্য আরও বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি ইঙ্গিত-ইশারা কুরআন করীমেরই তফসীর বিশেষ, যেমন তাঁহার প্রতিটি কার্য কুরআন করীমেরই ব্যাখ্যা বা তফসীর স্বরূপ। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়া ছিলেন যে, যদি তাঁহার আখলাক জানিতে চাও, তাহা হইলে কুরআন করীম পাঠ কর, কুরআন করীম যাহা কিছু বলিয়াছে, আঁ-হযরত (সাঃ) তাহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আখলাক তো পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। কেননা তাঁহার কার্যাবলী অবিকল কুরআন সম্মত, উহার আওতার বাহিরে নয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, নবী করীম (সাঃ) যে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে মুজাদ্দিদ আসিবেন—ইহা কুরআন করীমের কোন্ আয়াতের তফসীর? তবেই আমরা এই হাদিসটির সঠিক অর্থ জানিতে পারিব অন্যথায় আমাদের ভ্রম হইতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বিভিন্ন সময়ে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই হাদিস কুরআন করীমের আয়াতে-ইস্তেখলাফের একটি তফসীর বা ব্যাখ্যা। এই আয়াতে অনেকগুলি কথাই বর্ণিত হইয়াছে এবং খেলাফতের বিভিন্ন সেলসেলা বা শৃঙ্খলের উল্লেখ আছে। ইহার একটি তফসীর নবী করীম (সাঃ) এই করিয়াছেন যে, প্রতি শতাব্দীর

শিরোভাগে দ্বীনের মুজাদ্দিদ সৃষ্টি হইবেন। তদনুযায়ী আপনারা যদি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর গ্রন্থাবলী গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, যেখানেই তিনি তজদীদে-দ্বীন (ধর্ম সংস্কার) বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন কিম্বা কোন তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি খেলাফতের উল্লেখ নিশ্চয় করিয়াছেন (ইল্লা মা শায়াল্লাহ)। অতএব তিনি এতদসংক্রান্ত সার্বিক আলোচনাতে, বিস্তারিত ভাবেও এবং ইঙ্গিত-ইশারায়ও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, খেলাফত এবং তজদীদে-দ্বীন (ধর্ম-সংস্কার) একই জিনিষের দুইটি নাম। এবং এই ওয়াদা যে দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসিবেন উহা আয়াতে ইস্তেখলাফে প্রদত্ত ওয়াদার এক অংশ বিশেষ। আয়াতে ইস্তেখলাফে উহার অতিরিক্ত ওয়াদাও দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ ভিন্ন আকার-পদ্ধতির খেলাফত প্রতিষ্ঠার ও ওয়াদা আছে। উহার একটি সেই আকার-পদ্ধতি যাহার উল্লেখ উক্ত হাদিসে করা হইয়াছে। নবী করিম (সাঃ)-এর অন্যান্য ইরশাদে খেলাফতের অন্যান্য আকার-পদ্ধতির উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

খেলাফতের অর্থ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যাহা করিয়াছেন তাহা এই যে:

"খলিফার অর্থ স্থলাভিষিক্ত, যিনি তজদীদে-দ্বীন (ধর্মের সংস্কার বা নবায়ন) করেন। নবীগণের জামানার পরে যে অন্ধকার বিস্তার লাভ করে উহা নিরসনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন, তাঁহাদিগকে খলিফা বলা হয়।"

(মলফুজাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮০)

সুতরাং খলিফার অর্থ নবী আকরাম (সাঃ)-এর সেই স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যিনি প্রয়োজনের সময়ে তজদীদে-দ্বীনের উদ্দেশ্যে আগমন করেন এবং মানুষের মধ্যে সহি ইসলামী রুহ্ (প্রেরণা) সৃষ্টি করেন, এবং বেদাত সমূহ ইসলাম হইতে উৎক্ষাৎ করেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সপক্ষে রূপ উপকরণ সৃষ্টি করেন যাহার ফলে তাহারা আল্লাহতায়ালার রহমত এবং তাঁহার ফজলের অধিকতর ওয়ারিশ হইতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আয়াত-ইস্তেখলাফে যে كما ('কামা') এবং منكم ('মিনকুম') শব্দ আছে, ইহাকে উক্ত আয়াতের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে এক বুনিয়াদী গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে, যেরূপ ও যে রঙে মুসায়ী উম্মতে খেলাফতের নিযাম কায়েম করা হইয়াছিল, সেইরূপ ও সেই আকারেই উম্মতে মুস্লিমায় খেলাফতের নেযাম কায়েম করা হইবে। আমি প্রথমে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর দুই-তিনটি উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শুনাইতে চাই যেগুলিতে তিনি বলিয়াছেন যে, মুসায়ী উম্মতের খেলাফত এবং মুহাম্মদীয় উম্মতের খেলাফতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। আপনারা এই হাওয়ালা সমূহ শুভীর মনোনিবেস সহকারে শ্রবণ করুন। অতঃপর আমি কতকগুলি কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিব। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন:

"অর্থাৎ খোদাতায়ালা এই উম্মতের মুমেন এবং সৎকর্মশীলগণের জন্য এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলিফা বানাইবেন, যেরূপে তিনি পূর্ববর্তীগণকে বানাইয়াছিলেন, অর্থাৎ সেই পদ্ধতিতে ও সেই পন্থানুযায়ী এবং সেই সময়সীমা ও জামানার অনুরূপ এবং সেই জালালী ও জামালী রূপ ও রঙে, যাহা বনী ইস্রাইলে আল্লাহ-তায়ালার সুন্নত বা বিধান হিসাবে ঘটিয়াছিল, এই উম্মতেও সেইরূপেই খলিফাগণ নিয়োজিত হইবেন। তাঁহাদের খেলাফতের ধারাবাহিক শৃঙ্খল সেই শৃঙ্খল হইতে গৌণ হইবে না, যাহা বনী ইস্রাইলের খলিফাগণের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের খেলাফত-পদ্ধতি সেই পদ্ধতি হইতে ভিন্নতর বা বিপরিত হইবে না যাহা বণী ইস্রাইলের খলিফাগণের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছিল। ..... পূর্ণ সাদৃশ্যের ইশারা—যাহা كما استخلف الذين من قبلهم ("কামাসতাখলফাল লাযীনা মিন কাবলিহিম"— আয়াতাংশ হইতে বুঝা যায়—ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, এই সাদৃশ্য, খেলাফতের সময়কাল এবং খলিফাগণের সংস্কার-পদ্ধতি ও আবির্ভাব-ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব, যেহেতু ইহা সুস্পষ্ট যে, বনী ইস্রাইলের মধ্যে খলিফাতুল্লাহ হওয়ার মনসব ও মর্যাদা হযরত মুসা (আঃ) হইতে শুরু হইয়াছে এবং এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বনী ইস্রাইলের নবীগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া পরিশেষে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ণ হওয়াতে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর উপর ঐ শৃঙ্খলের অবসান ঘটে..... সুতরাং যখন কুরআন করীম স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছে যে, ইসলামী খেলাফতের শৃঙ্খল উহার উন্নতি ও অবনতি বা উহার জালালী ও জামালী অবস্থার দিক দিয়া ইস্রাইলীয় খেলাফতের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য পূর্ণ হইবে, এবং ইহাও বলিয়া দিয়াছে যে, আরবী উম্মী নবী-এ-আকরাম (সাঃ) মূসার সদৃশ, সেইহেতু এই প্রসঙ্গে নির্ঘাত ও সুনিশ্চিতরূপে বলা হইয়াছে যে, ইসলামে খলিফাগণের শিরোমণি (সাঃ) যেমন মুসা (আঃ)-এর মসীল বা সদৃশ,—যান এই সেলসেলা ইসলামীয়ার সেনানায়ক ও রাজাধিরাজ এবং সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং সকলের উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু এবং স্বীয় রূহানী সন্তানদিগের আদি পুরুষ —সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম—তেমনভাবে এই সেলসিলার খাতাম পূর্ণ সাদৃশ্যের দিক দিয়া সেই মসীহ ইবনে মরিয়ম (তুল্য ব্যক্তি), যান এই উম্মতের লোকদিগের মধ্য হইতে ব-হুকমে রাব্ব (আমার রবের আদেশক্রমে) মসীহি সিফাত বা গুণাবলীর রঙে রঙীন হইয়াছেন।" (এযালায়ে আওহাম, ১ম সংস্করণ, পৃ: ৬৬৮—৬৭৩)

এই মজমুন প্রসঙ্গেই যে নবী আকরাম (সাঃ) খেলাফতের শৃঙ্খলে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, এবং বাস্তবিকপক্ষে যখন আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাইতে চাই, তখন খলিফাতুল্লাহ হিসাবে সত্যিকার অর্থে এবং পূর্ণরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, আর কেহ নহে। সেই জন্য তিনিই খেলাফতে উম্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি মুজাদ্দিদে আজম। সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ নবী আকরাম ব্যতীত আর কেহই নহে। 'লেকচার সিয়াল কোট'

গ্রন্থে হযরত মদীহ মওউদ (আঃ) বলেন, "সুতরাং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সত্য প্রকাশে মুজাদ্দিদে-আযম (শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক) ছিলেন, যিনি হারান সত্যকে জগতে সম্যক পুনরুদ্ধার করেন।" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ ৪)

এবং তিনি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, সারা জগতকে অন্ধকার ও জুলমাত হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আনয়নের কাজ মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতীত অন্য কেহ করেন নাই। পূর্ববর্তী নবীগণ স্ব স্ব যুগে স্ব স্ব জাতির দিকে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাদিগকে এবং যে সকল জাতির প্রতি তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকেও যতটুকু সুযোগ ও সামর্থ দিয়াছিলেন তদনুযায়ী এক সীমিত সময় ও সীমিত যুগে কোন কোন নির্দিষ্ট জাতিকে তাঁহারা শয়তানী অন্ধকাররাশী হইতে বাহির করেন এবং তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী তাহাদিগকে ঐশী আলোকে আলোকিত করেন কিন্তু একমাত্র একজন ব্যক্তিই জন্মলাভ করিয়াছেন—সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম—যিনি সমগ্র জগতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছেন এবং যিনি এখন কিয়ামত পর্যন্ত মুজাদ্দেদীয়তে-উয্মার মোকামে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সমস্ত জগতকে সর্ব প্রকারের আঁধার হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া আল্লাহতায়ালার নূরের দিকে আকর্ষণ ও আনয়নের কাজ এই মুজাদ্দিদে-আজমের উপর সমর্পিত হইয়াছে।

সুতরাং এখন উক্ত শৃঙ্খলে শ্রেষ্ঠতম খেলাফতের অধিকারী হইলেন হযরত নবী করীম আকরাম (সাঃ)। নিজস্ব রঙে সীমিত গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য হযরত মুসা (আঃ) ও আল্লাহতায়ালার মুজাদ্দিদ ও খলিফা ছিলেন, কিন্তু নিখিল জগতের একজনই শ্রেষ্ঠতম মুজাদ্দিদ ছিলেন এবং তিনি হইলেন হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। (ক্রমশঃ)

[সপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান), ২২শে মে ১৯৭৯ হইতে অনুদিত]

—০—

মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমগণের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

সকল মুরুব্বী ও মুয়াল্লেম সাহেবানের নিকট মোহতারম আমীর সাহেবের পক্ষ হইতে সার্কুলার মারফত জানানো হইয়াছে যে, আগামী ২২শে জুন ১৯৭৯ তারিখ হইতে এক মাসের জন্য আহমদনগরে রিফ্রেশার কোর্স ও ট্রেনিং ক্লাশ অনুষ্ঠিত হইবে। উহাতে তাঁহারা যেন ২১ শে জুন পর্যন্ত জরুরী বিছানা-পত্রসহ পৌঁছিয়া যান।

কেন্দ্র হইতে হযরত আকদাস (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে একজন বুজুর্গ উক্ত ক্লাশ পরিচালনার উদ্দেশ্য প্রেরিত হইতেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪৩)

অষ্টম যুক্তি-প্রমাণ

ফেরেস্তাদের সাহায্য ও অনুবর্তিতা

আল্লাহতা'লা আদমকে সৃষ্টি করে ফেরেস্তাদেক আদেশ দিলেন 'সিজদা' করতে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে :

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ

(ওয়া এয্ কুলনা লিল মালায়েকাতিস জুহু লি আদামা ফাসাজুহু ইল্লা ইবলিস ।) অর্থ—"এবং সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমরা ফেরেস্তাদিগকে বলিয়াছিলাম : আদমকে 'সিজদা' করো। অতঃপর তাহারা 'সিজদা' করিল। কিন্তু ইবলিস করিল না।" (আল বাকারা : ৩৫) উল্লেখযোগ্য যে এস্থলে আদমের প্রতি সিজদা করার প্রাসঙ্গিক অর্থ আদমের এবাদত করার সমতুল্য ছিল না। পক্ষান্তরে এস্থলে 'সিজদা' করার প্রাসঙ্গিক অর্থ ছিল আদমকে মান্য করা বা তাঁর অনুবর্তিতা করা। 'সিজদা' শব্দটির এরূপ অর্থে ব্যবহার আরবী ভাষা-সম্মত বলে অভিধানে উল্লেখ রয়েছে (যেমন 'লিসান-আল-আরব' নামক অভিধানে 'সাজদাহ' শব্দের অধীনস্থ প্রদত্ত অর্থ দেখা যেতে পারে।) সিজদার আদেশ দ্বারা এবাদত করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই—অনুবর্তিতা বা অনুগমনের আদেশ প্রদান করা হয়েছিল। আল্লাহতালা কর্তৃক যে কোন 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির জন্য ফেরেস্তাদেক এরূপ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়ে আসছে। কারণ এটাই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত যে, ঐশী উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহতালার তরফ হতে আবির্ভূত হন, তিনি ফেরেস্তাদের কাছ থেকে সাহায্য এবং সমর্থন লাভ করেন।

বদর এবং খন্দকের যুদ্ধের দৃষ্টান্ত :

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনুরূপভাবে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছেন বদরের যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ফেরেস্তাগণ শত্রুদের মনে প্রচণ্ড ভয়-ভীতির সৃষ্টি করেছিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক মুষ্টি ধুলি উঠিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। আর সেই মুহূর্তেই এক প্রবল বাতাস এমনভাবে বইতে লাগলো যার ফলে শত্রুদের পক্ষে টিকিয়া থাকা শক্ত হয়ে উঠলো। এই ধুলি নিক্ষেপ সম্বন্ধে আল্লাহতালা বলেছেন :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

(ওমা রামাইতা এয্ রামাইতা ওলাকিন্নাল্লাহা রামা)

"এবং যখন তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করো নাই, পরন্তু আল্লাহ স্বয়ং নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" (সুরা আনফাল ১৮)

অনুরূপভাবে খন্দকের যুদ্ধে ফেরেস্তাদের তরফ হতে সাহায্য পেয়েছেন আঁ হযরত (সা:) মুসলিম সৈন্য বাহিনী শত্রুদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের চাপে বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষের জনৈক দলপতি কর্তৃক প্রজ্জলিত আগুন বাতাসের ধাক্কায় হঠাৎ নিভে যাওয়ার ফলে শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

এরূপ বহু ঘটনা হযরত রসুল করীম (সা:)-এর জীবনে রয়েছে। বিভিন্ন সময় তাঁকে নানাভাবে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, কিন্তু সকল প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূল কিভাবে ফেরেস্তারা আল্লাহতা'লার প্রত্যাদিষ্ট নবীকে সাহায্য করে সেই সত্যতাই বার বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফেরেস্তার সাহায্য সাধারণতঃ প্রকৃতিক উপায় ও উপকরণ-জনিত কার্য-কারণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে। হযরত রসুল করীম (সা:)-এর সময়ে ফেরেস্তাগণ প্রাকৃতিক কার্য কারণ সমূহকে তাঁর সুবিধা ও সহযোগিতার অনুকূলে প্রবাহিত করায় কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকতো।

একটি ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা

হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ:)-এর জীবনে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে—যে সব ক্ষেত্রে তিনি ফেরেস্তাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা লাভ করেছেন। এরূপ একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন এক সময় হযরত মীর্যা সাহেব তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সহ (যার মধ্যে একজন হিন্দু ছিল) ছাদের নিচে নিদ্রিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনে জেগে উঠলেন এবং ভাবলেন যে, এখনই ছাদ ভেঙ্গে পড়তে পারে। তিনি নিদ্রামগ্ন সঙ্গীদের জাগালেন এবং সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বল্লেন। কিন্তু তারা চতুর্দিকে দেখলো এবং কোন প্রকার বিপদের নিদর্শন দেখতে না পেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পুনরায় হযরত মীর্যা সাহেব অনুভব করলেন যে, ঘরের ছাদটি এখনই ভেঙ্গে পড়বে। তিনি আবার সকলকে জাগালেন এবং এবার সকলকে তাদের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বের করে নিয়ে আসলেন। সকলে বের হয়ে আসার পর তিনি নিজেও বের হয়ে আসলেন। যেইমাত্র হযরত মীর্যা সাহেব বাইরে তাঁর পা রাখলেন, অমনই কড় কড় করে ছাদটি ভেঙ্গে পড়লো। এই ঘটনা লক্ষ্য করে সকল সঙ্গী আশ্চর্যান্বিত হলো এবং হযরত মীর্যা সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানালো।

আশ্চর্যজনক ঘটনার সমাবেশ

বহু আশ্চর্যজনক ঘটনার দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত মীর্যা সাহেবের জীবনে যেগুলো বর্ণনা করতে হলে পুস্তকের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে। কোন কোন সময় এরূপ হয়েছে যে, কোন সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ রোগীর জন্য ইলহামের মাধ্যমে তিনি নিরাময়ের ব্যবস্থার কথা

জানতে পেরেছেন। কখনো হয়তো স্বপ্নের মাধ্যমে অথবা 'কাশফের" মাধ্যমে তিনি কোন একটি বিশেষ রোগের যথাযথ প্রতিষেধক ঔষধের বিষয়ে জানতে পেরেছেন। একবার তিনি দেখতে পেলেন যে, ফেরেস্তা এসে তাঁকে বলছেন : 'পেপারমেন্ট"। অর্থাৎ পেপারমেন্টেই প্রতিষেধক ছিল বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে কোন কোন সময় তিনি হত্যাকারীদের সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই ফেরেস্তার মাধ্যমে জানতে পেরে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুদের মনে প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে যেভাবে বদরের যুদ্ধে শত্রুদের চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কখনো এরূপ হয়েছে যে, কোন কোন দুর্ধর্ষ শত্রুভাবাপন্ন আগন্তুক তাঁকে দেখা মাত্রই হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় শান্ত হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর 'বয়েত" গ্রহণ করেছে।

প্লেগের নিদর্শন :

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল প্লেগের ঘটনা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার মাধ্যমে। এই ঘটনার মধ্যে আল্লাহতালার মনোনীত ব্যক্তি এবং তাঁর অনুগামীদের জন্য ফেরেস্তাগণ কিভাবে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। প্লেগের আনুপূর্বিক ঘটনাবলী পরবর্তী দশম যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। এখানে শুধু আনুসঙ্গিক বিষয়টি উল্লেখ করা হলো। হযরত মীর্যা সাহেব রুইয়ার (সত্য স্বপ্নের) মাধ্যমে দেখতে পেলেন যে, একটি প্রকাণ্ড হাতী পৃথিবী ব্যাপী মহাধ্বংস সাধন করছে। এই আসন্ন প্লেগের প্রতীক স্বরূপ দৃষ্ট হাতী এবং উহার আক্রমণের ফলে অগণিত লোকের জীবন নাশের ইঙ্গিত ছিল। ঐ স্বপ্নে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, হাতিটি যখন তাঁর নিকটবর্তী হয়েছিল তখন উহা পোষমানা পশুর ন্যায় শান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বিনীতভাবে সসম্মানে তাঁর নিকট বসেছিল। এর দ্বারা এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, হযরত মীর্যা সাহেব প্লেগ হতে অব্যাহতি লাভ করবেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি এবং তাঁর প্রকৃত অনুসারীবৃন্দ আসন্ন প্লেগের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবেন এবং কাদিয়ান অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্লেগ সম্বন্ধে আরো কতকগুলো ইলহাম তিনি পেয়েছিলেন। তিনি জানালেন যে, তাঁর নিজ বাগগৃহ বিশেষভাবে নিরাপদ থাকবে। যথা সময়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলো এবং সারা দেশে মহামারীরূপে ছড়িয়ে পড়লো। অগণিত লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। প্রতি বছর শত সহস্র লোকের প্রাণবিয়োগ হলো। হযরত মীর্যা সাহেবের অনুসারীদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হলো না। তাঁরা হযরত সাহেবের নির্দেশে প্লেগের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো যাতে ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। অসংখ্য মানুষ এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে এবং হযরত সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। হাজার হাজার লোক হযরত সাহেবের কাছে বয়েত গ্রহণ করেছে। আপেক্ষিকভাবে প্লেগের ক্ষয়ক্ষতি হতে অধিকতর রক্ষাপ্রাপ্ত আহমদীয়া

জামাতের সদস্যগণ হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতার সুস্পষ্ট নিদর্শন হয়ে থাকলেন। তাঁর ইলহামী দাবী এই ছিল যে, "আগ হামারী গোলাম, বলকে গোলামোঁ কী ভি গোলাম হ্যায়" অর্থাৎ "আগুন হলো আমাদের গোলাম এবং গোলামদিগেরও গোলাম"

এইভাবে ফেরেস্তাগণ তাদের ভূমিকা পালন করেছিল। তারা হযরত সাহেবের প্রতি অনুবর্তিতা এবং সমর্থনের হস্ত সেভাবেই প্রসারিত করেছিল যেভাবে আল্লাহতালার মনোনীত এবং আশীষ-প্রাপ্ত বান্দার প্রতি করা উচিত।

কাদিয়ানেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ২/৩ বছরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। হযরত মীর্যা সাহেবের গৃহে প্লেগ অনুপ্রবেশ করতে পারে নাই। পক্ষান্তরে কাদিয়ানের বাহিরে অন্যান্য স্থানে প্লেগের আক্রমণ ১০ বছর এবং কোন কোন স্থানে ততোধিক কাল পর্যন্ত প্লেগের আক্রমন অব্যাহত ছিল।

হযরত মীর্যা সাহেবের প্রতিবেশী গৃহেও প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল। তাঁর নিজ বাস-গৃহের পরিসর যথেষ্ট বড়ো ছিল। প্রায় একশত জন সদস্য বিশিষ্ট এই পরিবারটিতে তাঁর পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং তাদের পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিরা প্রায় স্থায়ীভাবে তাঁর সাথে বসবাস করতেন। কিন্তু এতদসত্বেও তাঁর গৃহস্থিত একটি ইঁদুরও প্লেগে আক্রান্ত হয় নাই। ইঁদুর প্লেগের আক্রমণের সর্বপ্রথম শিকার হয়ে থাকে। চতুর্দিকের এরূপ ভয়াবহ অবস্থা সত্বেও ফেরেস্তার সাহায্য এবং সমর্থন ছাড়া কিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ রক্ষা পেলেন? কি কারণে এই অত্যাশ্চার্য পার্থক্য সূচিত হলো? এমনকি ডাক্তারগণও প্লেগের শিকার হয়েছে। দূরবর্তী সম্ভ্রান্ত এবং স্বাস্থ্যকর এলাকা সমূহে বসবাসকারী ব্যক্তিরাও প্লেগ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, এবং প্লেগের প্রতিষেধক টীকা গ্রহণকারীদের মধ্যেও বহু লোক প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। কিন্তু হযরত মীর্যা সাহেবের এবং তাঁর গৃহের অন্তস্থিত কোন ব্যক্তিরই প্লেগ হয় নাই—যদিও তাঁর গৃহটি যথেষ্ট বাড়া ছিল এবং প্লেগের আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের জন্য আরো বহুলোক সেই গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল।

যদি কাদিয়ানে একেবারেই প্লেগ না হতো অথবা যদি হযরত মীর্যা সাহেবের প্রতি-বেশীদের মধ্যে প্লেগের আক্রমণ না হতো তা হলে প্লেগের আক্রমণ সংক্রান্ত নিদর্শনটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতো এবং তাঁর গৃহের সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিমূলক নিদর্শনটিকে আকস্মিক ঘটনা বা প্রকৃতিক খেয়াল-খুশী বলে অভিহিত করা যেতো। কিন্তু তিনি বহু পূর্বে প্লেগের ঘটনা এবং প্লেগ হতে তাঁর অব্যাহতির সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রকাশ করেছিলেন ওহী-ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে। কাদিয়ানে প্লেগ এলো, কিন্তু সেই প্লেগ এসেছিল চাকরের মত — অর্থাৎ সেই প্লেগ তার কাজ ঠিক করেছিল, তবে পূর্ব নির্ধারিত গণ্ডীকে অতিক্রম করে নয়। প্লেগের গতিবিধি ফেরেস্তাদের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আর ফেরেস্তাদের এইরূপ অনুবর্তিতা এবং সমর্থন কোন মিথ্যা দাবীকারকের স্বপক্ষে প্রকাশিত হতে পারে না। প্লেগের ঘটনা এবং এইরূপ অন্যান্য আশ্চর্যজনক ঘটনাবলী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, হযরত মীর্যা সাহেবের প্রতিশ্রুত সংস্কারক তথা ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী সন্দেহাতীতরূপে সত্য এবং ঐশী সমর্থনপুষ্ট। (ক্রমশঃ)

('দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ 'Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্দরী

সুসমাচারগুলির ক্রুশ বিদ্ধকরণ সক্রান্ত বিবরণ

একটি নিরীক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৬। যীশুর কবর খুদেছিল কে এবং কোথায় ?

"আর তাঁহাকে যে স্থানে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই স্থানে এক উদ্যান ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নুতন কবর ছিল, যাহার মধ্যে কাহাকেও কখনও রাখা হয় নাই।... ... ... তাহারা সেই কবরের মধ্যে যীশুকে রাখিলেন।" (যোহন ১৯ : ৪১, ৪২)

"... ... এবং শৈলে খোদিত এমন এক কবর মধ্যে তাঁহাকে রাখিলেন, যাহাতে কখনও কাহাকেও রাখা হয় নাই।" (লুক ২৩ : ৫৩)

"এবং শৈলে খোদিত এক কবরে রাখিলেন..." (মার্ক—১৫ : ৪৬)

এবং যোশেফ দেহটি লইয়া... ...তাহার নিজের নুতন কবরে রাখিলেন—যাহা তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন।" (মথি—২৭ : ৫৯ : ৬০)

প্রথম তিনজন সাক্ষী বলছেন না যে, কার আদেশে কবর খনন করা হয়েছিল। লুক বলেছেন এমন ভাবে, যেন অনেক আগে থেকেই কবরটি সেখানে ছিল। মথিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কেননা তিনিই কেবল পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, যোশেফ অরিমাথীয়ই কবর খনন করে রেখেছিলেন। উপরের উদ্ধৃত বর্ণনায় যে সকল সত্য নিহিত আছে তা হচ্ছে :—

(ক) উদ্যানটি—যার মধ্যে কবরটি বিদ্যমান ছিল তা ক্রুশবিদ্ধকরণের স্থানের কাছাকাছি ছিল।

(খ) কবরটি খনন করা হয়েছিল শৈলের মধ্যে, সুতরাং ইহা প্রশস্ত ছিল।

(গ) ইতিপূর্বে এই কবরে আর কাউকে রাখা হয়নি, সুতরাং এর বাতাস দূষিত ছিল না।

(ঘ) ইহা ছিল নুতন খোদিত

(ঙ) যোশেফ অরিমাথীয় উদ্দেশ্যমূলকভাবেই ইহা খনন করেছিলেন।

এই বিষয় পাঁচটির সঙ্গে যদি আর একটি বিষয় যোগ করা যায়, তাহলে গোটা পরিকল্পনার ব্যাপারটাই দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে উঠবে ; এবং সেই বিষয়টি হচ্ছে—নীকদীম—যিনি এই ঝুঁকির কাজে যোশেফ অরিমাথীয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তিনি—যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ক্রুশবিদ্ধ করণের ঠিক পূর্ব রাত্রিতে (যোহন—১৯ : ৩৯)।

অতএব এর সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সমগ্র পরিকল্পনাটির ভাবৎ ষ্ট্রাটেজি যীশুরও জানা ছিল। কেউ যদি বিষয়টি সতর্ক নিরীক্ষণ করে দেখেন, তা হলে স্বীকার না করে পারবেন না যে পীলাত তাঁর স্কীমটিকে সফল করার কার্যে সহযোগিতা করার জন্য, জোসেফ ও নীকদীমকে প্রয়োজনীয় সব কিছুই সরবরাহ করে রেখেছিলেন। তাঁরা পূর্বাহ্নেই প্রয়োজনীয় মশলা ইত্যাদি যোগাড় করে রেখেছিলেন। কবর কোথায় খুঁড়তে হবে, সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পীলাত।

আগাগোড়াই সাফল্য লাভ করেছিলেন পীলাত। যথাসময়ে যীশুর মূর্চ্ছা কেটে যায়, তিনি সংজ্ঞা ফিরে পান; এবং এভাবেই মৃত্যুর হাত থেকে যীশু বেঁচে যান।

(১৭) যীশুকে কবরে রাখার সময় স্ত্রীলোকগুলি কোথায় ছিল?

"মগ্‌দলীনি মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে ছিলেন, তাঁহারা কবরের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।" মথি-২৭ : ৬১

"তাঁহাকে যে স্থানে রাখা হইল, তাহা মগ্‌দলীনি মরিয়ম ও যোশির মাতা মরিয়ম দেখিতে পাইলেন।" (মার্ক—১৫ : ৪৭)

"আর যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত গালীলি হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পশ্চৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর, এবং কি ভাবে তাঁহার দেহ রাখা হয়, তাহা দেখিলেন" লুক—২৩ : ৫৫

যোহন এ সম্পর্কে নীরব। এবং সংক্ষেপিত সুসমচারগুলির কথাতেও কমবেশী। মথি ও মার্ক বলেছেন মাত্র দু'জন মরিয়মের কথা। কিন্তু লুক বলেছেন সব স্ত্রীলোকদের কথা, যারা গ্যালীলি থেকে সেখানে এসেছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া 'কবরের সামনে বসে থাকা' এবং 'তাঁকে যে স্থানে রাখা হয়'—তার মাধ্যও একটা অসামঞ্জস্য বিদ্যমান।

(১৮) কবর পাহারা দেওয়া সম্পর্কে ইহুদীদের দাবী :

মথি লিখেছেন—ইহুদীরা পীলাতের কাছে বলেছে :—

'মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে সেই প্রতারক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে পুনরায় আমি উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন পাছে তাহার শিষ্যরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর লোকদিগকে বলে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকট প্রহরিদল আছে, তোমরাই গিয়া যথাসাধ্য পাহারা দাও।" মথি—২৭:৬৩—৬৫

মথি ছাড়া আর কোনো সম্পাদক এই ঘটনার উল্লেখ করছেন না। এমন একটা গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে বাকী তিনজন বর্ণনাকারীর নীরবতা সুসমাচারগুলির অন্য সব গোপন রহস্যাবলীরই একটা নমুনা। সে যাই হোক, পীলাত ইহুদীদের দাবীটার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন এবং রুষ্টভাবে শুধু কতটুকুই বললেন, 'তোমরাই গিয়ে যেমন খুশী পাহারা দেও গে'। ইহুদীদের কাণ্ড-কারখানা দেখে পীলাতের হাসি পাচ্ছিল; কারণ, তারা পাহারার দাবী নিয়ে এসেছিল ক্রুশবিদ্ধকরণের পর দ্বিতীয় দিনে, এমনকি বিশ্রামবারেরও পরদিন, অথচ তখন যীশুর দেহ সেখানে ছিলই না।

(১৯) কে প্রথম গিয়েছিল যীশুর কবর দেখতে? কখন এবং কেন?

সুসমাচারগুলির বর্ণনায় এ সম্পর্কেও ঢের পার্থক্য দেখা যায়:

"বিশ্রাম দিন অবসান হইলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রভাতে মগ্‌দলীনি মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন।" মথি—২৮:১

"বিশ্রাম দিন অতীত হইলে পর মগ্‌দলীনি মরিয়ম, যাকোবের মাতা মরিয়ম এবং সালোমি সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন গিয়া তাঁহাকে মাখাইতে পারেন। পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাহারা অতি প্রত্যূষে, সূর্য উত্থিত হইলে, কবরের নিকটে আসিলেন।"

মার্ক—১৬:১-২

"কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যূষে তাঁহারা কবরের নিকট আসিলেন যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আসলেন।" (লূক ২৪:১)

"সপ্তাহের প্রথম দিন অন্ধকার থাকিতেই মগ্‌দলীনি মরিয়ম কবরের নিকটে যান।" (যোহন—২০:১) এই বর্ণনাগুলো থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা হলো:—

(ক) যোহনের মতে, প্রথম মগ্‌দলীনি মরিয়ম যান কবরের নিকটে। লূকের মতে গ্যালীল থেকে আগত স্ত্রীলোকেরা এবং তাঁদের সঙ্গে পুরুষরা প্রথম এসেছিলেন কবর দেখতে। মার্ক বলেছেন, যাকোবের মা মরিয়ম এক সঙ্গে এসেছিলেন প্রথম। এই গরমিলের সমন্বয় সাধন মুশকিল।

(খ) মাথ বলেছেন যে, স্ত্রীলোকেরা এসেছিলেন শুধু মাত্র 'কবর দেখতে'। মার্ক ও লূকের মতে, তাঁরা এসেছিলেন যীশুকে নশল প্রভৃতি মাখাবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যোহনের কোনো ধৈর্যই নেই এ ব্যাপারে কিছু বলার।

(গ) উপস্থিতির সময় সম্পর্কেও বর্ণনাগুলোর মধ্যে মিল নেই:

যোহন বলছেন, 'অন্ধকার থাকতেই, মার্ক বলেছেন, 'অতি প্রত্যূষে",.. 'সূর্য উঠিলে' কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কারা প্রথম এসেছিলেন, কখন এসেছিলেন, এ সম্পর্কে মত-পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দুস্থানী পাদ্রী কর্তৃক সুসমাচারের পাঠের বিকৃতি সাধন

আরবী সুসমাচারে লূকের বর্ণনায় (২৪:১) গ্যালীলের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষদের থাকার কথা আছে। কিন্তু আরবী থেকে উর্দুতে অনুবাদ করার সময় আমি দেখতে পেলাম, ১৯০৮ সালে মুদ্রিত লূকে পুরুষদের থাকার কথাটা বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল, হয়ত আরবীতেই কথাটা যোগ করা হয়েছে। কিন্তু না তো, আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম যে, ইংরেজি অনুবাদেও কথাটার উল্লেখ আছে এই বলে—and certain others with them আশ্চর্য যে, রয়াল প্রিন্টিং প্রেস হংকং-এ মুদ্রিত ও বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত—বাংলা তর্জমাতেও ঐ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে অথচ হিব্রু সুসমাচারে ও পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের কথাই আছে। কেবল উর্দু অনুবাদ ছাড়া (এবং বাংলাও) ইংরেজি, আরবী ও হিব্রু অনুবাদ সমূহে এই কথাটার উল্লেখ আছে যে, গ্যালীলের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অন্য পুরুষরাও কবরের পাশে গিয়েছিলেন। যাঁরা উর্দু (এবং বাংলা) তর্জমার জন্য দায়ী, তাদের জন্য দুঃখ করা ছাড়া উপায় কী? আল্লাহ তাঁদেরকে সত্যের পথে পরিচালিত করুন।

(১০) যাঁরা প্রথমে কবরের কাছে এসেছিলেন, পরে তাঁদের কি হয়েছিল ?

এ কথাটা লম্বা কেচ্ছা, যার বিবরণ দিয়েছেন যোহন (২০:১—১০), (লুক ২৪ : ২—৭). মার্ক (১৬:৩—৭), মথি (২৮:১—৭) সবাই। আমরা যদি সব বিবরণগুলি হুবহু উদ্ধার করে দেই, তাহলে বিষয়টা ভীষণ লম্বা হয়ে পড়বে, তাছাড়া এর বয়নগুলির মধ্যে উল্টা পাল্টা কম নেই।

প্রথমে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যোহনের সেই বর্ণনাটার প্রতি যেখানে তিনি যীশুর শিষ্যাদের সম্পর্কে বলছেন,

"কারণ—এ পর্যন্ত তাঁহারা এই শাস্ত্রকথা জানেন নাই যে, মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠিতে হইবে।" (যোহন—২০:৯)। এই বিবৃতিটা মৃতগণের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী (মথি—২৭ : ৬৩) সম্বলিত সব কটি রিপোর্টকেই বিপন্ন করে তুলেছে। ইহা ঐ সব শাস্ত্র বচনেরও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করছে যার দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যে, যীশু দ্বিতীয় বারের জন্য জিন্দা হয়ে উঠবেন। কেননা এই কথাটা যীশু কখনই তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেননি, যদি বলতেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাঁর দ্বিতীয় জীবন দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতেন (যেহেতু, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু বরণে কোনো পূর্ব-কেয়ামত বা শেষ বিচারের কথা নাই, সেহেতু দ্বিতীয় জীবনের প্রশ্নই ওঠে না।)

এখন আমি পূর্বোল্লিখিত গরমিল সমূহের মধ্য থেকে মাত্র একটির উপরে একটুখানি দৃষ্টি বুলাবো : যোহন লিখেছে যে, মগ্‌দলীনি মরিয়ম সরাসরি পীতর এবং যীশুর সঙ্গে যে সকল শিষ্যের সম্পর্ক ছিল তাদের কাছে গেলেন এবং খবরটা দিলেন। তিনি কোনো ফেরেশতাকেও দেখেননি, আর কাউকেও না। এটা ছিল প্রথমবারের ঘটনা। দ্বিতীয় বারে তিনি কবরের মধ্যে দেখতে পেলেন দু'জন ফেরেস্তা—একজন যীশুর মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে।

লুকের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যালীলির স্ত্রীলোকেরা কবরের মাধ্য প্রবেশ করেছেন এবং শুভ্রবস্ত্র পরিহিত দু'জন লোককে দেখতে পাচ্ছেন। এই লোক দু'টি যীশুর শিষ্যদের জন্য কোন সংবাদ স্ত্রীলোকদেরকে দিচ্ছেন না।

মার্কে আছে—স্ত্রীলোকেরা ডানপার্শ্বে উপবিষ্ট একজন যুবাপুরুষকে দেখলেন, যিনি তাঁদেরকে শিষ্যদের কাছে গিয়া শিষ্যদেরকে গ্যালীলি যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে বললেন।

মথিতে আমরা পাই, উভয় মরিয়ম একটা ভীষণ ভূমিকম্প হতেও একজন ফেরেস্তাকে নেমে আসতে দেখলেন, যিনি তাঁদেরকে বললেন যে, শিষ্যদেরকে বল, গ্যালীলিতে মসিহ তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন।

এই হচ্ছে গরমিলগুলোর সংক্ষিপ্তসার। সবিস্তারে বর্ণনার ক্ষেত্র এটা নয়।(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

খোদ্দাম ও আতফাল পাতা

(বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া)

১। কুরআন ক্লাশ :

সকল খোদ্দাম, আতফাল ও নাসেরাতকে এক মাসের মধ্যে সুরা ফাতিহা, সুরা এখলাস, সুরা ফালাক এবং সুরা নাস এই চারিটি সুরা অর্থসহ ভালভাবে মুখস্থ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

২। হাদীসের ক্লাশ :

المسلم مرآة المسلم

"আল মুসলিমু মিরআতুল মুসলিম"

অর্থ : একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের দর্পন স্বরূপ।

৩। নজমের ক্লাশ : 'নুসরাতে এলাহি' (আল্লাহর সাহায্য)

خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے
جب آتی ہے تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے
وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خس رہ کو اڑاتی ہے
وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے
کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے
کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ اک طوفان لاتی ہے
غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے
بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے

বাংলা উচ্চারণ

১। খোদাকে পাক লোগোঁ কো খোদা সে নুসরাৎ আতি হ্যায় ; জব আতি হ্যায় তো ফের আলামকো এক আলম দেখাতি হ্যায়।

২। উওহ্ বানতি হ্যায় হাওয়া আওর হার খাসে রাহ্‌কো উড়াতি হ্যায়, উওহ্ হো জাতি হ্যায় আগ আওর হার মুখালিফ কো জালাতি হ্যায়।

৩। কাভি উওহ্ খাক হো কর দুশমানোঁ কে সারপে পাড়তি হ্যায় ; কাভি হোকার উওহ্ পানি উনপে এক তুফান লাতি হ্যায়।

৪। গারাজ রুকতে নাহীঁ হারগেজ খোদাকে কাম বান্দোঁ সে ; ভালা, খালেক কে আগে খাল্‌ক্ কি কুচ পেশ জাতী হ্যায় !

(দুররে সমীন—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

অনুবাদ

১। খোদার পবিত্র ব্যক্তিগণ খোদার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন যখন ঐ সাহায্য আসে, তখন বিশ্বকে আর এক বিশ্ব দেখাইয়া দেয়।

২। উহা (আল্লাহর সাহায্য) কখনও হয় বায়ু ও পথের সব তৃণ উড়াইয়া নিয়া যায়; আবার কখনও হয় অগ্নি এবং প্রত্যেক শত্রুকে দগ্ধ করে।

৩। কখনো উহা মাটিরূপে শত্রুদের মাথায় নিপতিত হয়, কখনো উহা পানি রূপে তাহাদের উপর এক তুফান আনয়ন করে।

৪। বস্তুতঃ খোদার কাজ বান্দা কখনো রোধ করিতে পারে না। ভাল, স্রষ্টার বিপক্ষে সৃষ্টির কোন সত্বা আছে কি?

বিঃ দ্রঃ—সকল খোদ্দাম, আতফাল ও নাসেরাতকে একমাসের মধ্যে উপরোক্ত নযমটি অর্থসহ মুখস্থ করিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর:

৪। প্রশ্ন: কুরআন করীমের সর্ব প্রথম আদেশ কি?

উত্তর: "ইয়া আয়্যুহান্নাসু'বুদু রাব্বাকুমুল্লাজি খালাকাকুম ওল্লাজিনা মিন কাবলিকুম লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" —সুরা বাকারা: আয়াত ২২

অর্থ: হে মানব মণ্ডলী, তোমাদের সেই প্রভুর উপাসনা কর যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা সকল বিপদাবলী হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হও।

৫। মজলিস সংবাদ:

গত ১৪ ও ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯ রোজ শনি ও রবিবার রংপুরের মাহিগঞ্জে এবং শ্যামপুরে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জলসাগুলিতে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক বিষয়ে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখা হইয়াছে। বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিনিধি হিসাবে মোতামাদ জনাব মোঃ আব্দুল জলিল সাহেব উক্ত জলসাগুলীতে যোগদান করেন। স্থানীয় খোদ্দাম ও আতফালগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জলসার কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাহাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

গত ৬ ও ৭ই মে ১৯৭৯ রোজ রবি ও সোমবার সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪র্থ সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ জনাব আবদুল জলিল মজলিসের প্রতিনিধি হিসাবে জলসায় যোগাদান করেন। জলসায় মজলিসে আনসারুল্লাহ এবং মজলিসে খোদ্দামুল আহমদিয়ার এক যৌথ সভায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পেশ করা হইয়াছে।

এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মজলিস সমূহে নতুন ভাবে সাড়া জাগিয়াছে এবং খোদ্দাম ও আতফাল তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ইজতেমা :

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় ইজতেমা ইনশাল্লাহ আগামী সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হইবে। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মরকযীয়ার মোহতরম সদর সাহেবের অনুমোদন ক্রমে যথাসময়ে সঠিক তারিখ ঘোষণা করা হইবে।

রচনা প্রতিযোগিতা :

কেন্দ্রীয় ইজতেমা উপলক্ষে 'হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা' বিষয়ের উপর একটি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।

গ্রুপ—'ক' (খোদ্দাম-১ গ্রুপ) অনধিক ১৬ পৃষ্ঠা

গ্রুপ—'খ' খোদ্দাম—২ গ্রুপ) অনধিক ১০ পৃষ্ঠা

গ্রুপ—'গ' (সকল আতফাল) অনধিক ১০ পৃষ্ঠা

প্রত্যেক বিভাগের ১ম এবং ২য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম/আতফালকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ ৩১শে আগষ্টের মধ্যে অবশ্যই বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার নাযেম তালীম ও তরবীয়তের নিকট পেঁৗছাইতে হইবে।

—০—

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমাদীয়ার প্রবীণ আহমদী মৌঃ তারুমিয়া সাহেব গত ২৮শে মে দিবাগত রাত্রে, ৩-৩০মিঃ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .. ..রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। তিনি ৪ ছেলে ২ মেয়ে। স্ত্রী ও নাতী-নাতনী ও বহু গুণাগ্রহী রেখে গেছেন। তাঁর রুহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দির জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

আল্লাহতায়ালা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য্যধারণের তওফিক দিন এবং তাঁদের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনে অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca –1
Phone No. 283635
Editor : A. H Muhammad Ali Anwor